Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-V, Issue-II, October 2016, Page No. 13-19
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তা হ্রাসঃ কারণ অনুসন্ধান

তারক পুরকাইত
গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Swadheenata parabartee bangla pouranik natoker janapriota hras : karan annusandhan
Tarak Purkayet ,goveshak ,bangla vibhag, sidho kanho birsha viswavidyalaya,Purulia
The composition of fundamental bengali play begins in 1852 .G.C Gupta"s "kirtibilas" and Taracharan Sikdar"s "Vadrarjun' were composed in that year.Bengali mythological drama started its journy through the drama "vadrarjun' and it matured itself in the hand of Girish Chandra.Girish Ghosh took the mythological drama to its zenith of popularity .From the middlle of 19th century to the 3rd decade of 20th century bengali mythological drama churn the ocean of bengalee heart and flowed it to the tide of happiness and devotion .But this time honoured precepts or tradition of bengali mythological drama faced question tooth and nail after the 4th decade of 20th century and it gradually went in the path of extinction after indepandence .Once(or after a short period) Bengalees turned their face from composing or watching mythological play.approximately after 80 years(upto 'karagar' a play by Manmatha Ray) the Bengali drama which provided Bengalee with such the utmost flavour of milieu(culture or trend).And if we focus on the cause of the decline of popularity of the bengali mythological drama some points arises as follows :

i) Peaple became more materialistics because of the Second World War,riot,partition,refugee problem etc.Gana Natya Sangha was created on this platfrom and they tried to express this dilemma of life through their drama.

ii) The slaughter or destruction of the two world wars crated a confusion in human mind about the existence of God.So man turned their face from the sentiment of devotion ,the sucess of mythological drama.

iii) Several operas like "vahurupi" created to produce pure or genuine play,paid importance on the psychological aspects of the character in place of story or incident and as a result mythological drama based on story or incident lost its importance.

বিদেশির উদ্যোগে বাংলা নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন। রুশ দেশীয় গেরাসিম লেবেদেফের ‘বেঙ্গলি থিয়েটার’ এ ‘ The Disguise’ এর বাংলা অনুবাদ ‘কাল্পনিক সংবদল’ এর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের অভিনয় জীবনের সূত্রপাত। সালটা ১৭৯৫ খ্রিঃ। তারপর দীর্ঘ বছরের ব্যবধানে বাংলা নাটক রচনা ও তার অভিনয়ের কোন

সংবাদ পাওয়া যায় না। আমরা ধরে নিতে পারি ১৮৫২ খ্রিঃ এর পূর্বে কোন বাংলা নাটক রচিত হয়নি। অবশ্য নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ির শখের থিয়েটারে ১৮৩৫ খ্রিঃ বিদ্যাসুন্দরের পালা অভিনীত হয়েছিল। যদিও বিদ্যাসুন্দরের পালা নাটক নয়, গীতাভিনয় - অনেকটা যাত্রার সগোত্র।

বাংলা মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত ঘটে ১৮৫২ খ্রিঃ। ওই বছরে রচিত হয় জি সি গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রারজুন' নাটক। 'ভদ্রারজুন' নাটকের মধ্য দিয়ে বাংলা পৌরাণিক নাটকের পথ চলা আরম্ভ। গিরিশচন্দ্রের হাতে যার পরিপূর্ণ বিকাশ। বাংলা পৌরাণিক নাটককে জনপ্রিয়তার শীষে পৌছে দিয়েছেন গিরিশ ঘোষ।

উনিশ শতকে বাংলা পৌরাণিক নাটকের উদ্ভব ও স্বর্ণযুগ। এই শতকের অধিকাংশ নাট্যকার পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন। এর কারণ হল পুরাণের প্রতি বাঙালীর সহজাত আকর্ষণ। পুরাণের নানা কাহিনি দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায় চালিত হয়েছে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে। সান্ধ্য অবসরে চন্ডীমণ্ডপের গল্পে, আমোদে প্রমোদে, কথকথায়, ছড়ায়, যাত্রা, গানে বাঙালি পৌরাণিক ঐতিহ্যকেই লালনপালন করেছে কাল থেকে কালোত্তরে। তাই পৌরাণিক কাহিনি বা বিষয় সহজেই বাঙালিকে আকর্ষণ করেছে এবং আনন্দ দিয়েছে। তাছাড়া উনিশ শতকের শেষপাদে হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলন এবং প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও স্ংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা প্রবলভাবে চলছিল। পৌরাণিক নাটক রচনার মূলে যা দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা পৌরাণিক নাটক আপামর বাঙালীর হৃদয় সমুদ্র মন্থন করে তাকে আনন্দ ও ভক্তির জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু বাংলা পৌরাণিক নাটকের এই সুদীর্ঘ ঐতিহ্য বিশ শতকের চারের দশকের থেকেই প্রবল প্রশ্নচিহ্নের মুখে এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তা অবলুপ্তির পথে। এবং একটা সময় এসে পৌরাণিক নাটক রচনা বা অভিনয় দেখা থেকে বাঙালি মুখ ফিরিয়ে নেয়। প্রায় আশি বছরের কালপরম্পরায় যে পৌরাণিক নাটক বাঙালিকে পরম রসের যোগান দিয়েছে, সেই পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব। অবশ্য পূর্বে আমরা বাংলা পৌরাণিক নাটকের গৌরবজ্জল অধ্যায়কে একবার স্মরণ করে নেব।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পৌরাণিক নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন'(১৮৫২)। পঞ্চাঙ্ক এই নাটকটি মহাভারতের আদি পর্বের অন্তর্গত অর্জুন কর্তৃক কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা হরণের কাহিনি নিয়ে রচিত। এই নাটকটি সম্পর্কে সুকুমার সেন জানিয়েছেন- "ইহাই ইংরেজী ও সংস্কৃতের যুক্ত আদর্শে রচিত প্রথম মৌলিক মধুরান্তিক বাঙ্গালা নাটক। ভদ্রার্জ্জুনের কাহিনি পৌরাণিক কিন্তু পরিকল্পনায় সংস্কৃত নাটকের পুরোপুরি অনুসরণ নাই।"

বাংলায় প্রথম মৌলিক নাটক রচয়িতা রামনারায়ন তর্করত্ন তিনটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন এগুলি হল- 'রুক্মিনিহরণ (১৮৭১), 'কংসবধ' (১৮৭৫) 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫)। রুক্মিনিহরণের কাহিনি গৃহীত হয়েছে পুরাণ থেকে। কৃষ্ণকে আনয়নের জন্য কংস কর্তৃক অক্রুরকে বৃন্দাবনে প্রেরন, কৃষ্ণ কর্তৃক কংস নিধন এবং উগ্রসেনের পুনরায় সিংহাসন লাভ 'কংসবধ" নাটকটির বিষয়বস্তু । 'ধর্ম বিজয়" নাটকটি রচিত হয়েছে রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনি নিয়ে।

বাঙলায় শেক্স্পীয়রের নাটকের প্রথম বাংলা নাট্য অনুবাদক হরচন্দ্র ঘোষ 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮) নামে একটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন। নাটকটির কাহিনি গৃহীত হয়েছে মহাভারত থেকে। 'রাজা দুযধনের উরুভঙ্গাবিধি ও অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপূর্ব বৃত্তান্ত সুমার্জিত সাধুভাষায় বহুলাংশে ছন্দে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্য প্রবন্ধে ইংলন্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা করিলেন।''

'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'- অগত্যা বাংলা নাটক রচনায় কলম ধরলেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত। এবং প্রথম যে নাটকটি লিখলেন তা পৌরাণিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)। মহাভারতের

শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতী উপাখ্যান অবলম্বন করে নাটকটি রচিত। শর্মিষ্ঠার নির্বাসন থেকে নাটক শুরু হয়ে যযাতির জরামুক্তিতে নাটকের সমাপ্তি। সংস্কৃত নাট্যরীতি ও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সমন্বয়ে রচিত শর্মিষ্ঠা নাটকে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার প্রেমের জটিলতা ঈষা-দ্বন্দ্ব এবং প্রেমের নিষ্ঠাই প্রাধান্য লাভ করেছে।

শর্মিষ্ঠার পরে মাইকেল গ্রীক পুরাণের Apple of Discord"এর কাহিনি অবলম্বনে রচনা করেন "পদ্মাবতী' নাটকটি। 'পদ্মাবতী' নাটকের শচী, মুরজা ও রতি যথাক্রমে গ্রীক পুরাণের জুন প্যালাস ও ভিনাসের অনুরুপা।

সুকুমার সেন জানিয়েছেন দ্বিজ তনয়া নামে (যার কামিনী সুন্দরী দেবী) জনৈকা নাট্যকার ঊর্বশী নাটক (১৮৬৬) রামের বনবাস নাটক (১৮৭৭) এবং উষা নাটক (১৮৭১) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের সময়কালে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মঞ্চের প্রয়োজনে বেশ কিছু পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাবণবধ (১৮৮২) দৌপদী স্বয়ম্বর (১৮৮৪), রাজসূর্য যজ্ঞ (১৮৮৫), প্রভাস মিলন (১৮৮৭), পরীক্ষিতের ব্রম্ভ্রশাপ (১৮৮৯), ধ্রুব (১৮৯৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিহারীলালের পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের উৎসার লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা পৌরাণিক নাটকের ধারাকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেছেন মনোমোহন বসু। মনোমোহন বসু ছিলেন একজন গীতিকার। বাল্যকাল থেকেই হাফ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই তার নাটক গীতিবহুল। অনেকে তার পৌরাণিক নাটককে অপেরাধর্মী বা গীতাভিনয় বলে অভিহিত করেছেন- "মনোমোহন বসুর নাটকগুলি আলোচনা করিলে মনে হয় যে খাঁটি নাটক অপেক্ষা এইগুলিকে গীতাভিনয় নাম দেওয়া অধিকতর সঙ্গত। "(অজিত কুমার ঘোষ- "বাংলা নাটকের ইতিহাস')। মনোমোহন বসুর পৌরাণিক নাটকগুলি হল- 'রামাভিষেক' নাটক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস (১৮৬৭), সতী (১৮৭৩), হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫), পার্থপরাজয় (১৮৮১) এবং রামলীলা নাটক, প্রভৃতি। 'পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে যে রকম আধ্যাত্মিকতা ও তত্ত্বময়টা ফুটিয়া উঠিয়াছিল মনোমোহনের নাটকে তাহার কোন আভাস নাই।

গিরিশচন্দ্রের সিদ্ধি মূলত পৌরাণিক নাটক রচনায়। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যরচনার উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছিলেন- "কি রূপে ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া নাটকের উন্নতি সাধিব' তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁর উপদেশাবলি শ্রবণ করে গিরিশচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তাঁর পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটক বা অবতার-মহাপুরুষ জাতীয় নাটক রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর প্রভাব স্পষ্ট। উনিশ শতকের শেষপাদে হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলন এবং প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পুন্রুজ্জীবন প্রচেষ্টা প্রবলভাবে চলছিল। গিরিশচন্দ্র এই আন্দোলন ও প্রচেষ্টার সঙ্গে মনে প্রাণে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর ভাবাদর্শকে তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন- "হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।" গিরিশ ঘোষের পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁর প্রথম পৌরাণিক নাটক হল - 'রাবণবধ'। এই নাটক রচনা করে গিরিশচন্দ্র প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। এতে উৎসাহিত হয়ে তিনি 'সীতার বনবাস' নাটক রচনা করেন। বনবাসিনী সীতার অশ্রুজলের প্লাবনে বাঙালি মহিলারাও সেদিন ভেসে গিয়েছিলেন। এবং তারা থিয়েটারে দর্শক হিসাবে আসতে শুরু করলেন। ইতিপূর্বে বাংলা রাঙ্গালয়ে ভদ্রঘরের মহিলারা দর্শক হিসাবে খুব বেশি আসতেন না। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর "নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন "সীতার বনবাসই প্রথম বাংলার মা-জননীদের নাট্যশালায় অভিনয় দর্শনে আগমনের জন্য সমস্ত দ্বিধা সংকোচের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। পরবর্তীকালে গিরিশ ঘোষ যে সমস্ত পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - ল্ক্ষণ বর্জন, সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতা হরণ, পাণ্ডব গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, প্রহ্লাদচ্রিত্র, জনা, তপোবল প্রভৃতি। এছাড়া অবতার-মহাপুরুষ জাতীয় নাটক যেমন- চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস, বুদ্ধ, বিশ্বমঙ্গল,

রূপসনাতন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের ভক্তিরসের প্রাবল্যে উনিশ শতকের আপামর বাঙালি সেদিন ভেসে গিয়েছিল।

গিরিশচন্দ্রের সময়কালে রাজকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক নাটক রচনা করে পৌরাণিক নাটকের ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন। তাঁর লেখা 'তরণী সেন বধ', ভীমের শরশয্যা', হ্রধ্নুভঙ্গ, প্রহ্লাদচরিত্র, নরমেধযজ্ঞ, যদুবংশ ধ্বংস, রামের বনবাস, প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অমৃতলাল বসু থিয়েটারের দাবিকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই দর্শকদের চাহিদানুযায়ী তিনিও পৌরাণিক নাটক রচনায় কলম ধরেছেন। অমৃতলালের পূরনাঙ্গ পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা দুটি। এগুলি হল হরিশ্চন্দ্র (১৮৯৯) এবং যাজ্ঞসেনী (১৯২৮)। হরিশ্চন্দ্র নাটকটি ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ড কৌশিক" নাটক অবলম্বনে রচিত। যাজ্ঞসেনী অমৃতলালের সার্থক পৌরাণিক নাটক। মহাভারতে্র কৌরব ও পাণ্ডবদের বিবাদ কাহিনির মূল উপজীব্য।

গিরিশ যুগে আরও অনেক অপ্রধান নাট্যকার পৌরাণিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। যেমন কালিদাস সান্যালের ' নলদময়ন্তি' দুর্গাদাস কর এর ' স্বর্ণকমল', নিমাই চাঁদ শীল এর 'ধ্রুব চরিত্র' নন্দলাল রায়ের 'অর্জুন বধ', মহেশ্চন্দ্র দাশগুপ্তের ' অভিমুন্যবধ',সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জয়দ্রথ বধ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকে পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তার প্রাবল্য বিশ শতকে এসে মন্থর হয়ে পড়ে। বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বয়কট, স্বদেশি আন্দোলন প্রভৃতি জাতীয় জীবনে যে প্রবল ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে নাট্যকাররা নাটকের মধ্য দিয়ে স্বদেশ প্রেমের উত্তেজনাকে কাজে লাগালেন। তাই এই সময় ঐতিহাসিক নাট্য রচনায় ঝোঁক বেশি। অবশ্য পৌরাণিক নাটক যে রচিত হয়নি তা নয়। তবে পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়ে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে।

বিশ শতকের সূচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বেশ কিছু পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন- ব্ভ্রুবাহন (১৮৯৯), সাবিত্রী (১৯০২), ভীষ্ম (১৯১৩), উলুপী (১৯১৬), মন্দাকিনী (১৯২১) এবং নরনারায়ণ (১৯২৬)। মূলত মহাভারতের কাহিনি নাটকগুলির উপজীব্য। ক্ষীরোদপ্রসাদ ভীষ্ম নাটকটি দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভীষ্ম' নাটকের তুলনায় বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অবশ্য নাট্যগুণে দ্বিজেন্দ্র লালের নাটক অনেক বেশি সমৃদ্ধ। 'উলুপী" নাটকের বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব থেকে। উলুপীর পাতিব্রত্য, জীবনরস পিপাসা এবং প্রেম পিপাসা মিলে চরিত্রটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয় নাটক 'নরনারায়ন'। দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্ধ নাটকের মূল বিষয়। নাটকটি শুরু হয়েছে কর্ণের ব্রহ্মশাপ প্রাপ্তি থেকে এবং কর্ণের মৃত্যুতে নটকের সমাপ্তি। নাটকের নামকরণে অর্জুন ও কৃষ্ণ প্রাধান্য পেলেও নাটকের মূল কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে কর্ণ। বাইরের নানা দ্বন্ধের সঙ্গে কর্ণের মনোজগতের দ্বন্ধ নাটকটিতে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় গিরিশ ঘোষের ভক্তিমূলক চরিত নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্ষীরোদ প্রসাদ রচনা করেন 'রঙ্গাবতী' এবং 'রামানুজ' নামক দুটি নাটক।

দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটক রচনায় রাজাধিরাজ। তবে তিনি তিনখানি পৌরাণিকনাটকও রচনা করেছেন। এগুলিহল- 'পাষানী' (১৯০০), সীতা (১৯০৮) এবং ভীষ্ম (১৯১৪)।' পাষানী' নাটকে গৌতম পত্নী অহল্যার কামনা বাসনা, প্রবৃত্তির তাড়না আধুনিক নারীর অতৃপ্ত কামনার ভাবনাকেই উদ্রিক্ত করে। 'সীতা' নাটকে সীতা চরিত্রে পরলোকগতা পত্নীর এবং রাম চরিত্রে নাটকের নিজ হৃদয়ের আর্তি প্রকাশিত। দ্বিজেন্দ্রলাল আধুনিক জীবন দৃষ্টিতে পৌরাণিকচরিত্রগুলিকে দেখেছেন এবং সে ভাবেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

পৌরাণিক নাটক রচনায় অপরেশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ থাকায় তিনি নাটক রচনায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তাঁর সর্বপ্রথম মৌলিক পৌরাণিক নাটক কর্নাজুন। মহাভারতের সর্বাপেক্ষা নাটকীয় অংশ তিনি নাট্যাঁকারে উপস্থাপিত করেছেন। কর্নাজুনের পর তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ' নামে

একটি নাটক রচনা করেন। কংস বধ থেকে আরম্ভ করে শ্রী কৃষ্ণের তনু ত্যাগ পর্যন্ত কাহিনি নাটকটির উপজীব্য। পরবর্তী কালে 'শ্রী রামচন্দ্র' নামে আরও একটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'পুস্পাদিত্য' 'শকুন্তলা' ইত্যাদি। এছাড়া মঙ্গলকাব্যের কাহিনি নিয়ে রচনা করেন 'ফুল্লরা' নাটকটি। অবশ্য তাঁর অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকই পৌরাণিক কাহিনির বিবরণ মাত্রেই পর্যবসিত, নাটকীয় রস সঞ্চারে অক্ষম।

মন্মথ রায় বেশ কিছু পৌরাণিকনাটক রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তার রচিত পৌরাণিকনাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চাঁদসদাগর (১৯২৭), দেবাসুর (১৯২৮), কারাগার (১৯৩০) প্রভৃতি। মন্মথরায়ের পৌরাণিকনাটকগুলিকে খাঁটি পৌরাণিকনাটক বলা যায় না। 'কারন পুরানের কোন বিশেষ ঘটনা কি কাহিনি ব্যতীত পৌরাণিকভাব, আর্দশ, নীতি, কিছু প্রদর্শন করা বতমান নাট্যকারের উদ্দেশ্য নহে'। ভক্তিভাব নাটকে তো নেই বরং গতানুগতিক সংস্কার ও নিষ্ঠার প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব আমরা লক্ষ্য করি। 'কারাগার' বা 'দেবাসুর'এ রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

পৌরাণিক নাটক রচনার মধ্য দিয়েই নাট্যকার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর আবির্ভাব। 'সীতা" নাটক তাঁর প্রথম নাটক। এই নাটক লিখে এবং অভিনয় করে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। শিশির কুমার ভাদুরির অনুপ্রেরনায় তিনি নাটকটি লেখেন। অবশ্য সীতা নাটকটির অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথের নাটকটি মোটেই পছন্দ হয় নি। পরবর্তীকালে যোগেশ চৌধুরী 'রাবন' নামে আরও একটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। গিরিশ ঘোষের ভক্তিমূলক চরিত নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক রচনা করেন।

পৌরাণিক নাটকের দৈবীভাব, ধর্মবিশ্বাস এবং ভক্তির পরাকাষ্ঠা কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে সমকালীন জাতীয় জীবনের উদ্দীপনা পৌরাণিক বিষয়াশ্রিত নাটকে প্রাধান্য পেল তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ মন্মথ রায়ের 'কারাগার" নাটকটি। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ নাটকটি সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছেন 'এই নাটকটির পৌরাণিক পরিবেশটি আমাদের বর্তমান বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে এত সাদৃশ্যযুক্ত, চরিত্রগুলির আবেগ এত জোরালো ও জীবন্ত, সংলাপ এত আবেগদীপ্ত এবং জাতীয় ভাবোচ্ছ্বসিত যে, সমসাময়িক স্বাধীনতাসংগ্রাম যে ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে সেই ধারণা প্রত্যেকটি উদ্দীপিত দর্শকচিত্তেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।'' পৌরাণিক বিষয় নাটকে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত। কংসের কারাগার আসলে পরাধীন ভা্রতভূমি। কংস হল অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকার। ভারত ভূমির শৃঙ্খলিত সন্তান হল বসুদেব, দেবকী, কঙ্কণ, কঙ্কা ইত্যাদি। কৃষ্ণ হল ভারতের ভাগ্য বিধাতা, ভারতবাসী যাকে জাগানোর সাধনা করছে। বসুদেব সংগ্রামী জনগনের নায়ক, তার সংগ্রাম অহিংস উপায়ে। বসুদেব চরিত্রে গান্ধিজির ছায়া সহজেই লক্ষণীয়। এইভাবে নাট্যকার পৌরাণিক আবহে সমসাময়িক রাজনৈতিক সংগ্রামের অগ্নিময় দিক প্রকাশ করেছেন।

মন্মথ রায়ের পর থেকে বাংলা পৌরাণিকনাটক রচনায় ভাঁটা পড়তে থাকে। এর জন্য অবশ্যই দায়ি দেশ কাল সমাজ পটভূমি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত শেষ হতে না হতে আর একটা মহাযুদ্ধ সারা বিশ্বব্যাপী অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উত্তাপ, দুর্ভিক্ষ, হিন্দ-মুসলমানের দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, অথনৈতিক সংকট, মূল্যবোধের অবক্ষয় মানুষের মনে 'কোন এক বোধ জন্ম নেয়'। এ বোধ এক প্রবল নৈরাশ্যের। যে নৈরাশ্যের চাকায় পিষ্ট হয়ে মানুষ বড় বেশি বাস্তববাদী হয়ে উঠেছিল। তখন পুরান নয়, ইতিহাস নয়-এক কথায় অতীত নয়, বর্তমান তার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। বর্তমান সমস্যা ও সমস্যা মুক্তির স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে বুঝেছিল 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসান রুটি'। এই সময় প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই ফ্রান্সের রমাঁ রোঁলার 'The People`s Theatre'এর আদর্শে ভারতে ১৯৪৩ খৃঃ গড়ে অঠে 'ভারতীয় গননাট্য সংঘ' (Indian People`s Theatre Association, I.P.T.A.)। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল ন্যায় সংগত অধিকার ও আশা আকাঙ্খা পূরনের দাবি সম্পর্কে মানুষকে সংগ্রাম সচেতন করে তোলা।

'গননাট্য সংঘ' এর বাংলা শাখা যখন গড়ে ওঠল, তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়নি। গান্ধিজির আগস্ট আন্দোলন তখন চলছে। সেই সঙ্গে ব্রিটিশদের দমন পীরন। দুভিক্ষ, শ্রমিক ধর্মঘট, নৌবিদ্রহ, হিন্দুমসুলমানের দাঙ্গা আজাদহিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবী- সব কিছু মিলিয়ে এক অস্থির সময়কালে দাঁড়িয়ে গননাট্য সংঘ বাস্তবাবাদী গননাটক রচনা ও অভিনয় করেছে। ফলতঃ এই সময় প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে 'আগুন', 'নবান্ন'এর মতো নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে, কোন পৌরাণিকনাটক নয়। কারণ সমস্যাদীর্ণ মানুষের মন থেকে দেবদেবীর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। যে ভক্তিরস পৌরাণিকনাটকের সিদ্ধি, সেখান থেকে দর্শক মুখ ফিরিয়েছে।

অতঃপর রাজনৈতিক কূপমুন্ডকতায় ভারতবর্ষ দ্বিখন্ডিত হল। সৃষ্টি হল উদবাস্তু সমস্যা এবং দেখা দিল অথনৈতিক সংকট। গননাট্যের রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার পছন্দ হল না শিল্পমোদী কবি সাহিত্যিক নাট্যকারের। শম্ভু মিত্র গণনাট্য ছেড়ে বেড়িয়ে গড়ে তুললেন 'বহুরূপী' (১৯৪৮) নামক নাট্যগোষ্ঠী। শুরু হল নবনাট্য আন্দোলনের। 'সৎ মানুষের নতুন জীবন বোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবন গঠনের মহৎ প্রয়াস যে সুলিখিত নাটকে শিল্প সুষমায় প্রতিফলিত, তাকেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক'।

'বহুরূপী' একটি গ্রুপ থিয়েটার। নবনাট্য আন্দোলন বলতে আমরা মূলতগ্রুপ থিয়েটার কে বলতে পারি। যারা নূতন নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শিল্পগুণ সমৃদ্ধ নাটক দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। বহুরূপী ছাড়া আরও অনেক গ্রুপ থিয়েটার গড়ে উঠেছিল। যেমন-নাট্যচক্র, ক্যালকাটা থিয়েটার, পিপলস লিটল থিয়েটার, থিয়েটার সেন্টার, রূপকার, শৌভনিক, সুন্দরম, নান্দীকার প্রভৃতি। তারা পশ্চিমের নব্য রীতির কাছ থেকে প্রয়োগ এবং নাটক দুইই নিচ্ছে। ফলে পাশ্চাত্য নাটকের অনুবাদ হচ্ছে, এমনকি মৌলিক নাটক রচনার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য ভাবধারা অনুসৃত হচ্ছে। উনিশ শতকের নাটক ছিল মূলতঃ কাহিনি নির্ভর। কিন্তু বিশ শতকের নাট্যকারেরা কাহিনির তুলনায় চরিত্রকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশেষতঃ স্বাধীনতা পরবর্তী কালে গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকাররা চরিত্রের মনস্তাত্বিক ভাবনাকে, মনের নানা ওঠাপড়া, দ্বন্দকে সুনিপুণ শিল্প দক্ষতায় রূপময় করে তোলার দিকে জোর দিয়েছেন। আর এ কারনেই কাহিনি নির্ভর পৌরাণিক নাটক গুরুত্ব হারিয়েছে এবং এ ধরনের নাটক রচনা বা নাটক অভিনয়ের ভাবনা থেকে সরে গেছেন গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পেশাদারী থিয়েটারও পৌরাণিকনাটক মঞ্চস্থ করা থেকে সরে এসেছিল। পৌরাণিক নাটকের এই পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২খন্ড)" গ্রন্থে লিখেছেন "যে পৌরাণিক নাটক রচনা দ্বারাই বাংলা নাট্য সাহিত্যের সূত্রপাত হিয়াছিল, এক শত বৎসরের মধ্যেই তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। বিশেষত এই পৌরাণিক নাটকই বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের সমগ্র ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল এবং ইহার মধ্যেই বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় নাট্যকারেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির রস ও রুচির ধারা যে কিভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। স্বাধীনতা লাভের পরও ঐতিহাসিক নাটক কোনও উপায়ে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিলেও, ইহার বহু পূর্ব হইতেই পৌরাণিক নাটক যে প্রকৃত পক্ষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই।''

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পৌরাণিকনাটক রচনা যে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা বলতে পারিনা। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও কিছু কিছু পৌরাণিকনাটক রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা বুদ্ধদেব বসুর নাম উল্লেখ করতে পারি। বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' রামায়নের কাহিনি অনুসরণে লেখা। প্রথম পার্থ (১৯৬৯), কালসন্ধ্যা (১৯৬৯) 'অনাম্নী অঙ্গনা' (১৯৭০)-প্রভৃতি কাব্যনাট্য মহাভারতের কাহিনি নির্ভর। কিন্তু নাটকগুলিকে যথার্থ পৌরাণিকনাটক বলতে পারিনা। কারণ বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য গুলিতে নাট্যকারের নিজস্ব প্রেম দর্শন ভাবনা আধুনিক ভবনার মোড়কে পরিবেশিত।

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বনিকের পালা' পৌরাণিকআবহে নির্মিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে প্রোজ্জবল আধুনিক ব্যক্তি মানুষের আদর্শের জন্য দ্বন্দ্ব সংঘাত ও একাকিত্বের বেদনায় প্রকাশিত। প্রসঙ্গত অরুন মুখোপাধ্যায়ের 'মারীচ সংবাদ' এবং মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার' নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। পৌরাণিকচরিত্র ও কাহিনির স্পর্শ থাকলেও নাটক দুটিতে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে।

পাপ পুণ্যের প্রশ্নে আমরা আজও শরণ নিই পুরানের কাছে। সাবিত্রী-সত্যবান, রাম-সীতা, হরিশচন্দ্রের কাহিনি আমাদের কাছে অতি পরিচিত। কিন্তু বাস্তবের দ্বন্দ্ব জটিল পথে চলতে চলতে 'গোটা মানুষের মানে' খুজতে গিয়ে আমাদের তাকাতে হয়েছে সমকালের দিকে। সমকালীন মানুষের সমস্যার দিকে। বিশষতঃ স্বাধীনোত্তর কালে মানুষের বহু কৌণিক সংকট এবং মানুষের মনের বহুকৌণিক ভাবনাকে প্রকাশ করার দিকেই সাহিত্যিকের ঝোঁক। নাট্যকারেরা এর ব্যতিক্রম নন। পৌরাণিকচরিত্র নয়, আধুনিক মানুষই নাটকের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী কালে বাংলা পৌরাণিকনাটক তার কৌলিন্য হারিয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। গিরিশ রচনাবলী (১)- সাহিত্য সংসদ।
২। বাংলা নাটকের ইতিহাস- অজিত কুমার ঘোষ।
৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন।
৪। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ক্ষেত্র গুপ্ত।
৫। নাট্যতত্ব বিচার- ডঃ দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়।
৬। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস – দর্শন চৌধুরী